# অনন্যসাধারণ কমিউনিস্ট

## প্রদোষ কুমার বাগচী

পি এস অর্থাৎ পি সুন্দরাইয়া। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় নাম। মানব মুক্তির মহান ঐতিহ্যগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের মাটিতে যাঁরা কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচার ও কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

জন্ম ১৯১৩ সালের ১লা মে অন্ধ্রপ্রদেশের মাটিতে, নেল্লোর জেলার একটি গ্রামে। সেই হিসাবে তাঁর জন্ম শতবর্ষের সূচনা এবছরের ১লা মে থেকে। সবার জন্মশতবর্ষ পালিত হয় না, জন্ম শতবর্ষ তাঁদেরই পালিত হয় যাঁরা সমকালীন যুগের মহান সামাজিক প্রয়োজন সাধনের জন্য উপযুক্ত, একই সঙ্গে সময়ের অগ্রবর্তী, ইতিহাসের গতি অনুধাবনের মতো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং তদনুযায়ী কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জনতাকে সংগঠিত করার শক্তির ধারক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক — সমকাল পেরিয়েও যাঁদের প্রাসঙ্গিকতা থেকে যায়। পি সুন্দরাইয়া ছিলেন সেই সব কালোত্তীর্ণ মানুষেরই একজন। প্রথম যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলা এবং পরবর্তী কালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠনে তাঁর ছিল অবিস্মরণীয় ভূমিকা। সে কথা স্মরণে রেখে পার্টিকে আরোও শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার অভিযানের ক্ষেত্রে বিংশতিতম কংগ্রেস থেকে সারা বছর ধরে পি সুন্দরাইয়ার জন্মশতবর্ষ পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

'কমিউনিস্ট'— কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির যে ভাবমূর্তি আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার একদিকে থাকে এমন একটি যাপন প্রক্রিয়া, যা গণমানুষকে মানবমুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য

উদ্বুদ্ধ করতে আকৃষ্ট করে, অন্য দিকে এক একটি ঘটনার সঙ্গে অন্যান্য চলমান ঘটনাপ্রবাহের পারস্পরিক ও টানাপোড়েনের সম্পর্কটিকেও মার্কসবাদ লেনিনবাদের আলোকে নিরূপণ করতে শেখায়। পি সুন্দরাইয়া ছিলেন সেই ধাঁচে গড়া এক আদর্শ কমিউনিস্ট, সমকালের মধ্যেও যিনি ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন।

জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পর্যায়ে তিনটি প্রধান কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি : ১। ছাত্র থাকাকালীন নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক হিসাবে প্রস্তুত করা, ২। সনাতনী ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং ৩। সমাজসংস্কারমূলক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের একজন সচেতন কর্মী ও সংগঠক হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা। প্রথমে তিনি মাদ্রাজের তিরুভেলুরে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে 'এস এস এল সি' কোর্স পাশ করে মাদ্রাজের লয়োলা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট থেকে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ছাত্রজীবনেই তিনি আত্মত্যাগ ও জনগণের সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, বাড়িতে হরিজনদের সাথে আহার করেন। সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮-৩০ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহূত সব কটি আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এভাবেই তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্তবাদ বিরোধী আন্দোলনের ফসল হিসাবে উঠে এসেছিলেন ও পরবর্তীকলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে অবিচল ছিলেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাগারে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে শিব ভার্মাসহ বেশ কিছু সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের যোগাযোগ ঘটে। কংগ্রেসে যুক্ত থেকে দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি কল্পনায় অনুভব করতেন তা আরো গভীরে প্রোথিত হয় সমাজতন্ত্রীদের সংস্পর্শে এসে। ১৯৩১ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা আমির হায়দার খানের সঙ্গে।

আমির হায়দার খান তখন দক্ষিণ ভারতে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সাক্ষাৎকারই সুন্দরাইয়ার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের এলাকায় ফিরে খেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন কিন্তু একথায় সবটা স্পষ্ট হয় না। খেতমজুরদের সংগঠিত করে তিনি তাঁদের গণআন্দোলনের বৃত্তে টেনে আনতে চান, কিন্তু তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, ব্যথা- বেদনা অনুভব না করলে তাঁদের মূল সমস্যা ও চাহিদাটাও তো তিনি ধরতে পারবেন না। তাই তিনি তাঁদের প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। একই সঙ্গে কাজ করতেন, একই সঙ্গে খেতেন। খামারের সব ধরনের কাজে নিজেকে তিনি দক্ষ করে তুলেছিলেন। তবে ফসল কাটার সময় কোমর ঝুঁকিয়ে নিচু হয়ে কিছুক্ষণ কাজ করলেই কোমরে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করতেন। আর ভাবতেন খেতমজুরেরা কীভাবে অত সময় ধরে নিচু হয়ে কাজ করেন। পরে বুঝেছিলেন জীবনধারণের জন্য তাঁদের সেসব উপেক্ষা করেই কাজ করতে হয়। এভাবেই তিনি যখন যাদের সঙ্গে থাকতেন তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হয়েও বৃহত্তর স্বার্থের কারণে তিনি নিজেকে পালটে নিয়েছিলেন। ফলে জাতপাত, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন তাতেও বহু মানুষের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন।

গ্রামে থাকাকালীন সময়ে তিনি খেতমজুরদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন, ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলেছিলেন, লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজেই স্কুল চালাতেন, দোকানের ম্যানেজারি করতেন আবার লাইব্রেরিয়ানও ছিলেন তিনিই । একই সঙ্গে জেলার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতেন ও তাদের কমিউনিজমের দিকে টেনে আনার কাজ করতেন। এভাবেই তিনি একাধারে রাজনৈতিক শিক্ষক ও খেতমজুরদের সংগঠক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি গ্রাম ধরে বা এলাকা ধরে কৃষক পরিবারের আর্থ- সামাজিক



অবস্থা ব্যাখা করতে পারতেন। শুধু অন্ধ্রে নয়, অন্যত্রও তিনি কমরেডদের গ্রাম সমীক্ষার কাজে উৎসাহ দিতেন। যখন যেখানে যেতেন কমরেডদের গ্রাম সমীক্ষার কাজে উৎসাহ দিতেন। চেষ্টা করতেন। ২৪ পরগনার তিনটি গ্রাম নিয়েও তিনি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। শ্রমজীবী নারীদের সংগঠিত করার কাজেও তাঁকে দক্ষ সংগঠকের ভূমিকায় দেখা যায়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কোনো আন্দোলনকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন, বরং সেই আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্তরে তুলে ধরা, প্রতিটি আন্দোলনকে সর্বভারতীয় বৃহত্তর সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে বিচার করা এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সংগঠন গড়ে তোলার প্রতি তাঁর সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করতেন। এই বিশিষ্টতার কারণেই কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অন্ধ্রপ্রদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেয়।

তিনি যখন কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের প্রচারে নামেন, তখন অন্ধ্রের বহু মানুষের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়বার্তা এদেশের সনাতনী ভাবধারার উপর যে প্রবল আঘাত হানে সে খবর অন্ধ্রের শিক্ষিত সমাজের কোন কোন অংশের মধ্যে প্রভাব ফেললেও মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের নামে অনেকে আঁতকে উঠতেন। সেই সময়ে, ১৯৩৩ -৩৪ সালে সুন্দরাইয়া নেমে যান কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের কাজে। দিন রাত এক করে কখনো হাঁটাপথে কখনও সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন বিভিন্ন জেলায়। বিপ্লববাদে বিশ্বাসী, জেল খেটেছেন, এইরকম মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের সংগঠিত মঞ্চ হিসাবে গঠন করেছেন 'মাদ্রাজ ইয়ুথ লীগ'। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত বহু প্রগতিশীল তরুণ কর্মীকে কমিউনিস্ট পার্টিতে টেনে আনার ক্ষেত্রে এই ইয়ুথ লীগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জেলায় জেলায় এইভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সমদর্শী মানুষদের নিয়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর এই ভূমিকা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট পাটির ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৯৩৪

সালের সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির এই বিকাশ সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই বছরেই অন্ধ্রে, পার্টি শাখা তৈরির আগেই, কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৩২ সালে আমির হায়দার খান গ্রেপ্তার হলে তাঁকে সাংগঠনিক অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। কতো আর বয়স— সবে কুড়ি পেরোনো যুবক, কিন্তু অসীম মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালাতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পার্টির আহ্বানে তিনি বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তাঁর নেতৃত্বে এস বি ঘাটে, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, পি কৃষ্ণপিল্লাই, এ কে গোপালনসহ বহু কমরেড কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মাদ্রাজ সম্মেলনে কৃষ্ণপিল্লাই, গোপালন ও নাম্বুদিরিপাদের সঙ্গে পি সুন্দরাইয়ার প্রথম সাক্ষাৎ। সম্মেলন শেষে সুন্দরাইয়া তাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ই এম এস-র 'হাউ আই বিকেম এ কমিউনিস্ট' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেখানেই ই এম এস বলেছেন, আমরা যখন বুঝতে পারি যে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন আমরা আমাদের সমস্যার কথা খুলে বলায় " তিনি ভারতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে পার্টির নীতি এবং ভারতীয় বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্ব বিপ্লবের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন"। এরপর থেকেই কেরালায় তাঁর যাতায়াতের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল তরুণদের তিনি কাছে টেনে নেন, বিভিন্নস্থানে পার্টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেন, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক কর্মীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ এ কেরালার কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সমস্ত সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং এভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির

কেরালা রাজ্য শাখার সূচনা ঘটে। সুন্দরাইয়া তামিলনাড়ুর প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন তৎকালীন মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী, যেখানে যুক্ত ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অঞ্চল। কিন্তু কোন আঞ্চলিকতার গন্ডিতে তিনি আবদ্ধ থাকেননি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সারা ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আপনজন। কি বাংলাদেশ, কি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, কেরালা বা পাঞ্জাব সব রাজ্যের মানুষের তিনি প্রিয় নেতা ছিলেন । পার্টি সদস্যদের প্রতি তাঁর অসীম দরদ ছিল। তিনি প্রত্যেকের খোঁজখবর রাখবার চেষ্টা করতেন। ১৯৪৩- ৪৫ সালে গোটা বাংলা যখন দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়ে, তখন ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য বাংলার কমরেডদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের চিকিৎসা ও বিশ্রামের কথা ভেবে সুন্দরাইয়ার উদ্যোগে অন্ধ্রের মছলিপত্তনমে পার্টির একটি রেস্ট হোম খোলা হয়েছিল। সেখানে বাংলার অনেক কমরেডের চিকিৎসা হয়েছিল। সুন্দরাইয়া সময় করে তাঁদের দেখতে যেতেন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বে পার্টিকে আত্মগোপনে থেকে কাজ করতে হয়েছিল। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের প্রলেতারীয় আদর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে মত প্রকাশ করেছিলেন। সুন্দরাইয়া সেই মতেরই শরিক হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তবে পার্টির শক্তি যেখানে যেখানে কম ছিল সেখানে শুধু প্রচার আন্দোলনের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশে তাঁরা গোপনে 'স্বতন্ত্র ভারত' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এতে পার্টির কথা থাকতো। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র এই পত্রিকা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে গোপনে কাজ করলেও ব্রিটিশ-বিরোধী জঙ্গীমনোভাব প্রচার করায় জনমানসে পার্টির সম্মান অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের ঘটনায় সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির সামনে একটা নতুন কর্মসূচী ঠিক করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি 'জনযুদ্ধের' নীতি গ্রহণ করেছিল যে নীতি ছিল ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করে দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রাম কার্যকর করার নীতি — যা নিয়ে দীর্ঘ পাঁচ

-ছ'মাস ধরে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, যার ভিত্তি ছিল জেল থেকে কারারুদ্ধ বন্দীদের চিঠি, দেউলি থিসিস ও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য, সর্বত্র সেটি প্রেরিত হয়েছিল ও জনযুদ্ধের নীতি কার্যকর করার জন্য ব্যাখ্যামূলক নোটও পাঠানো হয়েছিল কমরেডদের মতামত জানার জন্য। একই সঙ্গে সি সি পার্টি লেটার ও দি কমিউনিস্টে ছাপা হচ্ছিল কমরেডদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব। তখনও সুন্দরাইয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং তিনি এই প্রশ্নেই এম এস ও গোপালনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা করেছিলেন ও এই নীতির একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারের নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত আক্রমণ করলে যাঁরা মনে করতেন যুদ্ধের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে, এটা আর শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, এটা এখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মানুষের যুদ্ধ, পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁরা মনে করতেন ফ্যাসিবাদের পরাজয় হলে স্বাধীনতা আন্দোলন তরান্বিত হবে আর একমাত্র স্বাধীন ভারতই পারে ফ্যাসিবাদকে কার্যকরীভাবে রুখে দিতে। কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকা প্রকাশের জন্য তহবিল সংগ্রহের ডাক দেয়। সুন্দরাইয়া স্বচ্ছল ঘরের যুবক ছিলেন। তাই পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি কেন্দ্রীয় নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং বাস্তবসম্মতভাবেই অন্ধ্রপ্রদেশ পার্টি কমিটিতে সর্বসময়ের কর্মীদের জন্য নিয়মিত ভাতা প্রদানের প্রস্তাব পাস করিয়েছিলেন। চিরকালই তিনি মনে করতেন পার্টিকে সংগঠিত করতে ও জনগণের কাছে পার্টি নীতিকে নিয়ে যেতে সর্বক্ষণের কর্মীদের কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে হায়দরাবাদ রাজ্যে ১৯৪৬ সালে যে জঙ্গী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তাকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করার ক্ষেত্রে সুন্দরাইয়া অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। একই সঙ্গে নিজাম শাসনের বিলোপ ও হায়দরাবাদের বিভিন্ন ভাষিক অঞ্চলগুলিকে ভারতবর্ষে নিজস্ব ভাষাভিত্তিক রাজ্য যথা বিশালান্ধ্র, সংযুক্ত মহারাষ্ট্র এবং ঐক্যবদ্ধ কর্ণাটকের সঙ্গে জুড়ে



দেওয়ার দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন।

জনযুদ্ধের যুগ পেরিয়ে স্বাধীন ভারতে যখন কমিউনিস্ট পার্টির একক পথ চলা শুরু তখন ভারতীয় জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাবকে খাটো করে দেখিয়ে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের প্রভাবকে বড়ো করে দেখানো ও নেতৃত্বে পরিবর্তন এনে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেবার যে ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছিল তখনও সুন্দরাইয়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে পরিস্থিতির বিচারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টিও ছিল প্রখর। ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ কী হবে, তা নিয়ে তখন থেকেই অগ্রগামী মতামত পেশ করছিলেন তিনি।

১৯৪৩ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসেই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সুন্দরাইয়ার ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই কংগ্রেসেও তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। গঠিত হয়েছিল ৩১ জনের কমিটি। সে সময়ে সংস্কারবাদী ও সংকীর্ণতাবাদী এই দুই ঝোঁকের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইয়ে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। এই কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক থিসিস গ্রহণ করা হয়েছিল তার যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে সব কমরেড, পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তার মধ্যে একজন। একথা ঠিক যে পি সি যোশী সম্পাদক থাকাকালীন যে সমস্ত ভুল হয়েছিল তার অনেকগুলি এই কংগ্রেসে সঠিকভাবেই সংশোধন করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে গিয়ে যে নীতি ও কর্মধারা গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময় নিজেকে মার্কসবাদ- লেনিনবাদের আলোকে আরো সমৃদ্ধ করে শ্রমজীবী জনগণের নেতা হিসাবে সমগ্র পার্টিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কাজকেই তিনি ধ্যান জ্ঞান করে নিয়েছিলেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে এটাই ছিল কমিউনিস্টদের প্রথম কংগ্রেস। কিন্তু এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই শাসকশ্রেণি সারা ভারতে কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনে। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা কমিউনিস্টদের অঙ্কুরে বিনাশ করে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। আর স্বাধীন ভারতেও কংগ্রেসীরা চেয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিটাকেই

খতম করে দিতে। পশ্চিমবঙ্গে পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস সরকার। সারা ভারতে কমিউনিস্টদের আত্মগোপনে চলে যেতে হয়েছিল। এই আক্রমণ মোকাবিলা করে শাসকশ্রেণির হাত থেকে কমিউনিস্টদের রক্ষা করা, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। এই রকম অবস্থায় স্তালিনের সাহায্যে ও পরামর্শে একটি রাজনৈতিক ও কৌশলগত লাইন স্থির করতে হয়েছিল। সুন্দরাইয়া লিখেছেন, ভারতীয় কমিউনিস্টরা যে দুটো বড় প্রশ্ন নিয়ে তখন মাথা ঘামাচ্ছিলেন তা হলো ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে চলবে— রাশিয়ার পথে না চীনের পথে। অপরটি হলো পার্টিজান সংগ্রাম কী ও ভারতীয় সমাজে তার ভূমিকা কী। এসব প্রশ্নে স্তালিনের সাথে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছিল। সব আলোচনার পর স্তালিন মত প্রকাশ করেছিলেন— হুবহু কোনো পথ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। ভারতীয় বিপ্লবের পথ ভারতের সুনির্দিষ্ট পথেই চলবে। তার পর ১৯৫১ সালে পার্টি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল ঠিকই, তাহলেও সেই কর্মসূচীর ভিত্তিতে সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'গণশক্তি: স্তালিন জন্মশতবর্ষ' সংখ্যায় পি সুন্দরাইয়ার লেখা 'কমরেড স্তালিনের পরামর্শ' শীর্ষক নিবন্ধটি যে কোন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট কর্মীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান দলিল।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের লক্ষ্যে এদেশে যতগুলি বৃহৎ গণসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার সাফল্যেরও অংশীদার ছিলেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের একটি দিক হলো ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষক সমস্যার অনুশীলন ও কৃষক সমস্যা সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ। সারা ভারতের কৃষক সমস্যার খোঁজ খবর তিনি রাখতেন। ভূস্বামীদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে খেতমজুরদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয়ভাবে কৃষক সংগঠন গড়ে উঠলে তিনি হয়েছিলেন তার অন্যতম সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক। তবে তাঁর নেতৃত্বে



পরিচালিত তেলেঙ্গানা গণসংগ্রাম অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে এই ধরনের সংগ্রাম বিশেষ করে বাংলার তেভাগা আন্দোলন ও তেলেঙ্গানার গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কার্যকরী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিণত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে তেলেঙ্গানার গ্রামাঞ্চল যে কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৫ - ৪৬ সালে এই আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। পি সুন্দরাইয়ার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ লড়াইয়ের ময়দানে নেমে কমিউনিস্ট পার্টিকেই তাঁদের সমস্ত আশা ভরসার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অনুভব করেছিল, কারণ এই লোকপ্রিয় কৃষক অভ্যুত্থানের পিছনে বিশাল অন্ধ্র রাজ্য ইউনিটের বিরাট ত্যাগ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজাম শাসিত হায়দরাবাদ রাজ্যে এই সংগ্রাম জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়ে উঠেছিল এবং ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত সুন্দরাইয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থেকে মধ্যযুগীয় স্বৈরতন্ত্রের শিকড় ধরে টান দিয়েছিলেন। এর ফলে ভারতের কৃষিবিপ্লবের প্রশ্নটিও একেবারে সামনে চলে এসেছিল। এই প্রসঙ্গে পি সুন্দরাইয়া ' তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা' গ্রন্থে বলেছেন— *' ... জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষক সমাজের শ্রেণিবিভাগের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের প্রশ্ন, বিপ্লবে কৃষক সমাজের বিভিন্ন স্তর কী ভূমিকা নেয়, ভারতীয় বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, আমাদের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণি ও শহরকেন্দ্রগুলির সুনির্দিষ্ট স্থান ও ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণির প্রাধান্যকারী ভূমিকার ঠিক ঠিক অর্থটা ও গুরুত্বটা কি এবং আমাদের মতো এবং স্বল্পোন্নত ও পশ্চাদপদ দেশে যেখানে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের বেশি নয়, সেখানে তা বাস্তবে পরিণত করতে হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে কি ভূমিকা পালন করতে হয়, ইত্যাদি গুরুতর আন্তঃপার্টি বিতর্ক ও সিদ্ধান্তের জন্য উত্থাপিত হয়েছিল।'* পার্টি নেতৃত্বের সংশোধনবাদী অংশ মনে করতেন ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানার ভারতীয় ফৌজ প্রবেশ করার সাথে সাথেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তায় অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে

হঠকারীরা মনে করতেন 'তেলেঙ্গানা ভারতের ইয়েনান'। চীনের পথই আমাদের পথ। এই দুই রকম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়েছিল পি এস- কে। অবশেষে দীর্ঘ আন্তঃপার্টি সংগ্রামের পর অধিকাংশ সমস্যারই সন্তোষজনক জবাবসহ ঐক্যবদ্ধ পার্টি গঠনের প্রয়াস নেওয়া হয়।

১৯৫১ সালেই সারা ভারতে নির্বাচনী কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময়ে তিনি পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা নির্বাচিত হন। পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের দুই ভিন্ন পরিস্থিতিতে গণআন্দোলন পরিচালনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। নির্বাচনে পার্টির অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। সংসদসর্বস্বতা ও সংসদকে অস্বীকার করা—এই উভয় ঝোঁক থেকে পার্টিকে মুক্ত রাখতে তাঁর আপসহীন সংগ্রামের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালে 'পিপলস্ ডেমোক্র্যাসি'- তে প্রকাশিত 'ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের ধারণা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ হলো, অনেক বামপন্থী দল মনে করে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সংসদীয় সংগ্রামে জয়লাভের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ পথেই বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব। কিন্তু শাসকশ্রেণি কখনই যে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না সেকথা তাঁরা খেয়ালে রাখেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপদও আসে শাসকশ্রেণির দিক থেকে। আবার সংসদকে বর্জন করে, তার গুরুত্বকে অস্বীকার করে ব্যক্তিগত সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বারা বিপ্লবী শক্তির মধ্যে শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করা হয় এবং শাসকশ্রেণির হাতের খেলার পুতুলেই পরিণত হতে হয়। *'সশস্ত্র বিপ্লব তখনই সম্ভব এবং সার্থক হবে একমাত্র যখন ব্যাপক জনগণ বিপ্লবে অংশ নেবে ও দেশের বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের উপযোগী হবে এবং মার্কসবাদ- লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি সচেতন ও শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণির পার্টি যখন সংগঠিত করা যাবে। এ বিষয়ে আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতি অনুগত। বিদ্রোহ ও বিপ্লব একটি আর্ট - যা আয়ত্ত করতে হয়।'*

সব সময় তিনি পার্লামেন্টারি সংগ্রাম ও পার্লামেন্ট বহির্ভূত সংগ্রামকে

একটি রণকৌশল হিসাবেই বিবেচনা করতেন ও সেই হিসাবেই সমগ্র পার্টিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করতেন। পি সুন্দরাইয়ার নেতৃত্বে প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই পার্টির অভাবনীয় সাফল্য বুঝিয়ে দিয়েছিল ১৯৪৮-৫০ সালে কিছু ভুল ভ্রান্তি হলেও বিশেষ করে অন্ধ্রে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি জনসমর্থন সরে যায়নি। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাঁরা কমিউনিস্ট প্রার্থীদের জয়ী করেছিলেন। কংগ্রেসের বহু জামানত জব্দ হয়েছিল। নালগোন্ডা, খাম্মাম ও ওয়ারাঙ্গল জেলায় কমিউনিস্টরা চারটি বাদে সমস্ত আসনে জিতেছিল। সমগ্র তেলেঙ্গানায় ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪০ জন পি ডি এফ প্রার্থী এবং ১০ জন সোস্যালিস্ট ও সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। লোকসভায় ১৪টি আসনের মধ্য ৭টিতে জয়ী হয়েছিলেন পি ডি এফ প্রার্থীরা। কমিউনিস্টরা তখন পি ডি এফ প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন লড়েছিলেন। এই জয়গুলির ফলে অন্ধ্র নেতৃত্ব সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে তার যোগ্য স্থান ফিরে পেয়েছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের পর একক বৃহত্তম দল হিসাবে সংসদে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নির্বাচনী সংগ্রামে এই সাফল্যের কারণে পার্টি নেতৃত্ব সুন্দরাইয়াকে রাজ্যসভায় সদস্য করে সংসদে পাঠায়। রাজ্যসভার কমিউনিস্টদের ফ্লোর লিডার ছিলেন তিনি। লোকসভার ফ্লোর লিডার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এ কে গোপালন। তবুও সামগ্রিকভাবে সংসদীয় পার্টির নেতা হিসাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সুন্দরাইয়াকেই দেশ ও জনগণের স্বার্থে সংসদের উভয় কক্ষের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সংসদের ভিতরের ও বাইরের সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করার ও উভয় কক্ষের পার্টি সদস্যদের পরিচালনা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। এই গুরুদায়িত্বও তিনি সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে সুন্দরাইয়া নিজেই বলেছেন— *' লোকসভায় বিভিন্ন ইস্যুতে গোপালন তুলে ধরতেন পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি আর আমি মূল্যবৃদ্ধি, আর্থিক পরিকল্পনা ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের পার্টি গ্রুপের নীতি কি হবে নির্ধারণ করতাম। পার্লামেন্টেই হোক আর অন্ধ্র বিধানসভাতেই হোক, যেকোন ইস্যুতে আমি গভীর পড়াশুনা করতাম, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ও তথ্য*

*সহযোগে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতাম .. এভাবেই আমি পার্টি কমরেডদের মনে সংসদকে যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পাঠ-সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছিলাম।'* সাংসদদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, সংসদীয় অফিস তৈরি করা, বিভিন্ন রাজ্যের ওয়াকিবহাল কমরেড যাঁরা সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন বক্তব্যের তথ্য যোগাতে পারবেন তাঁদের নিয়ে অফিস তৈরি করা এবং প্রতিটি ব্যাপারে পার্টির কর্তব্য ও নীতি প্রত্যেক কমরেডদের তিনি বুঝিয়ে দিতেন। নিজের কাজ সম্পর্কে গভীর অনুশীলন ও নিষ্ঠা এবং বিষয় সম্বন্ধে দ্রুত উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাজ্যসভায় তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. রাধাকৃষ্ণাণ যখনই কোন সংসদ সদস্যের সাথে কথা বলতেন তখনই সুন্দরাইয়ার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। শোনা যায় সে সময় অনেক মন্ত্রীই নাকি তাঁদের দপ্তরের সচিবদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরা যেন পি এসের ভুল সম্পর্কে একদম নিশ্চিত না হয়ে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ না করেন। আসলে পি এস'-র প্রবল স্মৃতি শক্তি, বিষয়ের উপর গভীর দখল, তথ্যভিত্তিক নিখুঁত আলোচনা ও পরিসংখ্যানের ব্যবহারে অসামান্য পারদর্শিতাই ছিল তার কারণ। ১৯৫৫ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তিনি অন্ধ্রের বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৫৫ সালের এই নির্বাচন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং গন্নাবরম কেন্দ্র থেকে বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি অন্ধ্র বিধানসভায় সি পি আই গ্রুপের নেতা ছিলেন।

তিনি অনন্য সাধারণ পাঠক ছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা জানতেন। পড়েছিলেন নানা ধরনের অসংখ্য বই। ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক বহু বই তিনি পড়েছিলেন ছাত্র জীবনেই। একদম ছোটবেলা থেকেই পড়ার অভ্যাস তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তেলুগু কবিতা, গল্প, উপন্যাস পাঠ করতেন নিয়মিত। কমিউনিস্ট সাহিত্য ছাড়াও নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরও বহু বই তিনি পাঠ করেছিলেন। গান্ধীজির জীবনী তাঁর জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। স্কুলে থাকাকালীন তিনি নিয়মিত গান্ধীজির 'ইয়ং ইন্ডিয়া'

পড়তেন। বাল গঙ্গাধর তিলকের 'গীতা রহস্যময়' পাঠ করে তিনি একটি ক্লাস কম্পিটিশনে একটি প্রবন্ধে গীতার সঙ্গে বাইবেলের তুলনা করেছিলেন। এর জন্য অবশ্য তিনি শিক্ষকের ধমকও খেয়েছিলেন। কারণ এর মধ্যে দিয়ে নাকি তিনি গীতাকে উচ্চাসন থেকে নামিয়ে এনেছিলেন। তখন পরিস্থিতি এমনই ছিল। সমাজের এগিয়ে থাকা মানুষের একটা বড় অংশের মধ্যেও হিন্দু জাতীয়তা ও সামন্ত- সংস্কৃতির প্রতি দুর্বলতা, মোহ ইত্যাদি ছিল। ব্রিটিশ বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তাঁরা সামন্ত যুগের অচল সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে আঁকড়ে থাকতে চাইতেন। সেদিনের স্বাধীনতার স্বপ্ন তাই আশ্রয় করত ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মীয় কাহিনীকেই। স্বাভাবিকভাবে সেদিন বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী তরুণের হাতে হাতে এই ধরনের সাহিত্যই ঘোরাফেরা করতো। ভোগরাজ নারায়ণ মূর্তির 'বিমলা' তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন এই বই তাঁকে সমাজে সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা যুগিয়েছিল। তবে সুন্দরাইয়ার নিজেরই একটা সময়ে ধারণা ছিল গীতা, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ বা গান্ধীর চিন্তাভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ ঘটতে পারে। পরে তাঁর চিন্তার পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃত অর্থে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। 'এটাই যে একমাত্র সঠিক পথ, এটা পাঠ করার পরেই তা আমি অনুভব করেছিলাম', বলেছেন সুন্দরাইয়া। বইটি তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে ১৯৩৩ সালে তিনি এই গ্রন্থের পথম তেলুগু অনুবাদ প্রকাশ করে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্বও সম্পাদন করেছিলেন। এই সময়ে গ্রামে গ্রামে যখন তিনি খেতমজুরদের সংগঠিত করছিলেন তখন তাদের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের জন্য তেলুগুতে আরো বেশ কিছু বই অনুবাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন— *' আমি আমার গ্রামে আমাদের গ্রুপের যুবকদের শিক্ষিত করতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, হোয়াট ইজ টু বি ডান, ওয়েজ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল' এর তেলুগু অনুবাদ করেছিলাম। অনুবাদ করেছিলাম 'লেফট উইং কমিউনিজমেরও।'* মার্কসবাদ- লেনিনবাদের প্রতি

তাঁর ওই রকম আগ্রহ দেখে তাঁকে একবার রাশিয়ায় পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়ে আরো শিক্ষালাভ করে ফিরে আসুন তিনি। সব ঠিকও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

অধ্যয়ন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁর জীবনের কোন পর্যায়েই এমনকি গেরিলা স্কোয়াড পরিচালনার সেই ভয়ংকর দিনগুলিতেও তিনি অধ্যয়নের অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। আর সঙ্গে রাখতেন একটি ডাইরি। যখন যেখানে যেতেন, যা পড়তেন,যা দেখতেন, টুকে রাখতেন ডাইরির পাতায়। এখনও বিভিন্ন রাজ্যের কমরেড যাঁরা সুন্দরাইয়াকে দেখেছেন, কথা বলেছেন, তাঁদের অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর সেই ডাইরিতে নোট নেওয়ার বিষয়টি। প্রতিটি সংগ্রাম আন্দোলনে অংশগ্রহণের সাথে সাথে মার্কসবাদ -লেনিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য তিনি কমরেডদের অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তোলার উপর জোর দিতেন। কারণ তিনি মনে করতেন— বই হলো চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক, অবশ্য তার সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে নিতে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন বিপ্লবীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে লেনিনের সেই উক্তিকে,— *'বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা দিয়ে বিপ্লবের কাজে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে হলে অধ্যয়ন অপরিহার্য'*। ভারতের মাটিতে লেনিনের এই কথাটার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বোধ হয় পি সুন্দরাইয়া। সুন্দরাইয়া ১৯৭৪ সালের ৫ ই আগস্ট ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের মৃত্যুর পর কলকাতায় 'মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পাঠাগারের' উদ্বোধন করে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাঁর পুরো নাম হয়তো এখন অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন না। তাঁর পুরো নাম ছিল পুচালাপাল্লি ভেঙ্কট সুন্দরারামি রেড্ডি। কিন্তু তিনি পি সুন্দরাইয়া বলেই পরিচিত ছিলেন। সেটাও তাঁর জীবনের সংগ্রামী অধ্যায়েরই এক অংশ। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। যেহেতু কোন সন্তান প্রসব করার আগেই তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাই তাঁর পিতা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন ও ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে মানত করেন, পুত্র সন্তান হলে



তিনি সন্তানের নামের সঙ্গে 'ভেঙ্কট' কথাটি রাখবেন। সেই মতো তাঁর নাম হয় পুচালাপাল্লী ভেঙ্কট সুন্দররামি রেড্ডি। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতপাত বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি ভেঙ্কট কথাটি বাদ দেন। সামন্তবাদী ভাবধারায় পুষ্ট বংশকৌলিন্যের ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁর সমর্থন ছিল না। তাই উচ্চ ব্রাহ্মণ্য পরিবারের পরিচয়বাহী রেড্ডি পদবীটিও নিজের নাম থেকে নির্মমভাবে ছেঁটে দেন। এমনকি বাদ দিয়ে দেন সুন্দররামি শব্দটিও। পড়ে রইল শুধু পুচালাপাল্লী। বাড়িতে তাঁর আদরের নাম ছিল সুন্দরাইয়া। সেই নাম গ্রহণে অবশ্য তাঁর আপত্তি ছিল না। এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন পুচালাপাল্লী সুন্দরাইয়া বা পি সুন্দরাইয়া। আর শ্রমজীবী মানুষের কাছে তিনি ছিলেন শুধুই 'পি এস।' এ কোন সহজ ঘটনা নয়। জাত-পাত বিভাজন বিরোধী অবস্থানকে নিজের অভ্যন্তরে অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত না করতে পারলে তা সম্ভব ছিল না। আর কে জানে এই ধরনের লড়াইয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় প্রথমে পরিবারের মধ্যে, তারপর প্রতিবেশিদের মধ্যে, সবশেষে রক্তচক্ষু মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাজ। সমাজের তৈরি প্রতিবন্ধকতা ঠেলে অনেকের পক্ষেই খুব বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুক্তিকে প্রাধাণ্য দিতে গিয়ে স্বজন বিচ্ছেদের ভয় পান। কিন্তু পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তার ব্যতিক্রম। তাঁকে যে জাত-পাত আর ধর্মীয় গোঁড়ামির লড়াইয়ের এক অন্যতম অগ্রগামী সৈনিক হিসাবে দেখা হয়, এই ঘটনা তাঁর একটি অন্যতম কারণ। এই লড়াইয়ে বুদ্ধিমত্তার দরকার পড়ে না। প্রতিভাধরও হতে হয় না। এ হল চেতনার দিক। লাগে শুধু সংকল্পে থিতু থাকার দৃঢ়তা। এটাও পি এসের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই লড়াইয়ে আজও তিনি প্রাসঙ্গিক।

১৯৫১ সালে পার্টি কর্মসূচী গ্রহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই তেলেঙ্গানা সংগ্রাম প্রত্যাহারের সময় যে মতভেদগুলি আড়ালে চলে গিয়েছিল তা আবার সামনে চলে আসে। সংশোধনবাদী প্রবণতা মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। এই মতভেদগুলি ঠিক কী তা পরিষ্কারভাবে পি সুন্দরাইয়া তাঁর 'তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৯৫২ সালে পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে একটি বিশেষ কনভেনশনে পার্টির

তেলেঙ্গানা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। সম্পাদকের দায়িত্ব পান সুন্দরাইয়া। সেই সময় তাঁর প্রধান কাজ ছিল পার্টি কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা। পার্টিতে সংস্কারবাদী ঝোঁক তখন প্রবল আকার ধারণ করেছিলো। সুন্দরাইয়া এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে সংগ্রাম করেন। এই সংগ্রাম যে কতো কঠিন ছিল তা ১৯৫৩ সালে সুন্দরাইয়া প্রচারিত 'আমাদের মতপার্থক্য সম্পর্কে', নোটেই বোঝা যায়। যে নোটে তিনি লিখেছিলেন —*"... সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতভেদটা হলো, কৃষকরা যে জমি চাষ করছে সে জমি থেকে তাদের উচ্ছেদের জন্য কংগ্রেস সরকার ও ভূস্বামীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে, সেই প্রশ্নে। এই প্রশ্নেই সর্বত্র তীব্রতম মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং একদিকে রবিনারায়ণ রেড্ডি গোষ্ঠী এবং বৈধ কর্মীদের ও অন্যদিকে আত্মগোপনকারী কর্মীদের মধ্যে প্রতিদিনের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তারা যাই বলুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে তাদের কাজগুলি ভূস্বামীদের পক্ষেই যাচ্ছে। মানুষকে জমায়েত করার ও জমির দখল নিরাপদ করার মনোভাব তাদের নয় বরং যেকোনভাবে ভূস্বামীদের সঙ্গে আপসরফা করতেই তারা চায় — এই হলো আমাদের দৃঢ় অভিমত। কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমতও তাই। আত্মগোপনকারী কর্মীদের মধ্যে কিছু কিছু সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব থাকলেও জমির প্রশ্নে প্রধান বিচ্যুতিটি হলো দক্ষিণপন্থী সংশোধনকারী — এই হলো কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত অভিমত। কৃষক সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে, যখন গুরুতর মতভেদ রয়েছে (এটা আশ্চর্য যে, রাজেশ্বর রাও এটা বুঝছেন না), তখন ওই মতভেদগুলি পার্টি কমিটিগুলিতে আলোচনা না করে, রবিনারায়ণ রেড্ডির গোষ্ঠীগুলি এই সম্পূর্ণ ভুল প্রচার চালিয়েছে যে, আত্মগোপনকারী কর্মীরা হঠকারী কাজকর্ম চালাচ্ছিল।"*

এই কঠিন পরিস্থিতিতেই সুন্দরাইয়াকে সংগঠনের হাল ধরতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে অন্ধ্রে নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর মতপার্থক্যগুলি গুরুতর আকার ধারণ করে। কংগ্রেস সরকারের শ্রেণিচরিত্রের মূল্যায়ন এবং এই সরকার সম্পর্কে পার্টির মনোভাব কী হবে সেটাই ছিল মতপার্থক্যের প্রধান বিষয়। সেই সময় পার্টি নেতৃত্বের একাংশ যাঁরা ডাঙ্গে গ্রুপ হিসাবে পরিচিত



ছিল তাঁরা বলতেন কংগ্রেস সরকার জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির সরকার তাই এই সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। এঁরা এমন এক জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথা বলতেন যে সরকারের নেতৃত্বে জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণির অবস্থান থাকবে ভাগাভাগি করে। অর্থাৎ শ্রমিক-শ্রেণির নেতৃত্বে নয়, বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের যৌথ নেতৃত্বে। তাঁদের এটাই ছিল রণকৌশল। পার্টির অভ্যন্তরে বিপ্লবী অংশ যাঁরা এই ঝোঁককে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়েছিলেন পি সুন্দরাইয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁরা মনে করতেন ভারত রাষ্ট্র হলো বৃহৎ জমিদারদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-ভূস্বামীদের শ্রেণিশোষণের হাতিয়ার। সুতরাং জনগণকে সংগঠিত করে গণআন্দোলনের মাধ্যমে এই শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার ভাঙার নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই সময় থেকে, অর্থাৎ তৃতীয় কংগ্রেস থেকে ষষ্ঠ কংগ্রেস পর্যন্ত পার্টির অভ্যন্তরে মার্কসবাদ- লেনিনবাদের শিক্ষাকে সামনে রেখে সমস্ত মতভেদ দূর করে কমিউনিস্ট পার্টিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুন্দরাইয়া তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু সংশোধনকারীরা ঐক্যের জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত শর্তগুলিকে অস্বীকার করলে ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশেষে সুন্দরাইয়াসহ পার্টির ৩২ জন সদস্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক থেকে ওয়াক-আউট করেন এবং ৪নং অশোক রোডে দেশরাজ চাড্ডার বাড়িতে আলাদা পার্টি গঠন করার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ রক্ষার সংকল্প নিয়ে একত্রিত হন। পি সুন্দরাইয়া অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালীতে কনভেনশন করার প্রস্তাব দেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত'র প্রস্তাব ছিল পার্টি কংগ্রেসের আয়োজন করা হবে কলকাতায়। সেই মতো সব ঠিক হয়। তারপর তেনালী কনভেনশন সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সুন্দরাইয়া। এই কনভেনশনই ঐতিহাসিক 'তেনালী কনভেনশন' নামে পরিচিত। কনভেনশনে পতাকা উত্তোলন করে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ সেদিন বলেছিলেন 'আসুন আমরা প্রকৃত কমিউনিস্ট পাটি গঠনের শপথ গ্রহণ করি।' পি সুন্দরাইয়া স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন। কনভেনশন ১৯৬৪ সালের ৩১ শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেস

থেকে নতুন বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হয়। সুন্দরাইয়া পলিটব্যুরোর সদস্য হন। এই সময় ৯ জন সদস্য পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই নয়জনকেই 'নবরত্ন' বলা হয়। পার্টির সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হন তিনি। এটাই ছিল তাঁর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের প্রতি পার্টির উপযুক্ত স্বীকৃতি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের অন্যতম ছিলেন। প্রথম পার্টি কংগ্রেস থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলনের নেতা ও তেলেঙ্গানা গণসংগ্রামের রূপকার। সংসদীয় রাজনীতিতেও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। তদুপরি তিনি ছিলেন ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা, গণআন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও জাত-পাত বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক। সেই ১৯৫০'র দশক থেকে চলতে থাকা দীর্ঘ মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে পার্টির ভিতরে ও বাইরে নানা ঝড় ঝাপটা সামলে পার্টিকে প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গড়ে তোলার সংগ্রামে ও পরবর্তীকালে তাকে সংহত ও প্রসারিত করার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা শুধু অবিস্মরণীয় নয় ঐতিহাসিকও। আজ যেসব তরুণ কর্মী কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই প্রক্রিয়ার ইতিহাস জানতে চাইবেন তাঁদের অবশ্যই সুন্দরাইয়ার 'তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা গ্রন্থটি' পড়তে হবে। এই গ্রন্থেই তিনি লিখে গেছেন—' *... যে আন্তঃ পার্টি ঐক্য, ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহারের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল আনুষ্ঠানিক, উপর-ভাসা এবং সাময়িক। এবং বিভেদটা বাস্তবিক পক্ষে দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ঝোঁক রূপে দানা বেঁধেছিল। এটা নিছক আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না, এবং এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে, বিশাল অন্ধ্রের রাজ্য পার্টি ইউনিটে ১৯৫০-৫১ সালে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের সময় যা দেখা দিয়েছিল ১৯৬২-৬৩ সালে পার্টিতে ভাঙনের সময় বিশাল অন্ধ্র রাজ্য ইউনিটের ভাঙনের চরিত্র ও গঠনটি কমবেশি সেই রকমেরই*



*ছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতা ও কর্মী যাঁরা হয়তো তাঁদের আনুগত্য ও রাজনৈতিক বিশ্বাস পরে পরিবর্তন করে থাকতে পারেন, তাঁরা ছাড়া, যাঁরা কোন না কোন কারণে তেলেঙ্গানা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ও সংশোধনবাদী দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন; আর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যাঁরা শেষ মুহূর্ত অবধি সে সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন তাঁরা দৃঢ়ভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পিছনে সমবেত হয়েছেন। তেলেঙ্গানা সংগ্রাম এবং সে বীরত্বময় কৃষক সংগ্রাম পরিচালনার প্রশ্নে যেসব নানারূপ আন্তঃপার্টি বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তা এড়িয়ে গেলে, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন নিষ্ঠাবান ছাত্রের পক্ষেই ১৯৬২ -৬৩ সালে পার্টির ভাঙনের পথে অনিবার্যভাবে যে কারণগুলি তৈরি হয়েছিল তার গোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হবে না।'*

১৯৬৭ সালে তিনি খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের সংগ্রামী ভিতের উপর কৃষক ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'কৃষক ফ্রন্টে আমাদের কাজ' শীর্ষক একটি মূল্যবান দলিল রচনা করেছিলেন। ১৯৬৮ সালে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত আদর্শগত প্লেনামেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বছরেই জাতীয় সংহতি পরিষদের সভায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে তিনি জাত-পাত, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকভাবে বিপদ ও তার সমাধানের বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এই বছরের শেষের দিকে কোচিনে অনুষ্ঠিত অষ্টম কংগ্রেস ও ১৯৭২ সালে মাদুরাইয়ে অনুষ্ঠিত নবম কংগ্রেসে পুনরায় তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় পুনরায় তাঁকে আত্মগোপনে চলে যেতে হয়। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি অন্ধ্র রাজ্য কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

পরাধীন ভারতে যেমন তিনি কারাগারে বন্দীজীবন কাটিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতেও তাঁকে কারাজীবন ভোগ করতে হয়। ১৯৬২- র নভেম্বর মাস থেকে ১৯৬৩-র জুলাই এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে তিনি কারাগারে বন্দী

ছিলেন। সি পি আই(এম)- র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন অনেকে ভেবেছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু তারা ভুল ভেবেছিলেন। গণআন্দোলন বিকাশের সাথে সাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাংগঠনিক শক্তি দ্রুত বর্ধিত হচ্ছিল। এই সময় গণআন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে গেল ঐতিহাসিক পালাবদল। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার— ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। কিন্তু হঠাৎই ১৯৬৭ সালের মে মাসে নকশালবাড়িতে এক দুঃখজনক ঘটনায় কয়েকজন কৃষক, মহিলা ও শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উগ্র বাম বিপ্লবীরা শুনতে পেলেন 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ'। ফেরী করে বেড়ালেন মুক্তাঞ্চল গঠনের স্বপ্ন। অন্ধ্রের নাগি রেড্ডি প্রমুখ কয়েকজন উগ্র বামনেতা কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বকে নয়া সংশোধনবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ডাক দিলেন। গণসংগ্রাম গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে তারা চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান স্লোগান তুলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। এই সময় পার্টিকে পুনরায় সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে সুন্দরাইয়াকে কঠিন লড়াই পরিচালনা করতে হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ১৬ই জুন বাসবপুন্নাইয়ার সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতিতে সুন্দরাইয়া বাম-বিচ্যুতিকে প্রতিহত করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য তুলে ধরার আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনে হঠকারীদের মুখোস খুলে দিয়েছিলেন তিনি। মনে রাখা দরকার সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পার্টি যথাক্রমে এদেশের সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদীদের সমর্থন করেছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও আদর্শে অবিচল থেকে মার্কসবাদ লেনিনবদের ভিত্তিতে একটি সচেতন ও শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণির পার্টি হিসাবে ভারতের কমিউনিস্ট পাটি (মার্কসবাদী)-কে শ্রমজীবী মানুষের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন পি সুন্দরাইয়া।

তাঁর এই গৌরবময় সংগ্রামী ভূমিকার কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬৫ সালে তাঁকে মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। সেখানে অস্ত্রোপচার করে তাঁর পাকস্থলীর একটা বড় অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পাকস্থলীর কাজ সম্পন্ন করতে হতো অন্ত্রের সাহায্যে। ভারতে ফিরেই তাঁকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। ওই সময় তাঁর স্ত্রী লীলা সুন্দরাইয়াও চোখের সমস্যায় এতই ভুগছিলেন ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তবুও মাসে ১৫ দিন অন্তর তিনি পি এস' কে দেখতে যেতেন। পি এস নিজেও ভাবছিলেন এই সময় লীলার পাশে থাকা দরকার। এমনকি জেলে থাকলেও এখন লীলার পাশে থাকা খুবই প্রয়োজন। এই সময় তিনি লীলা সুন্দরাইয়াকে জেল থেকে একটি পত্রে যা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো, এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কী মনোভাব তাঁর মধ্যে কাজ করতো। তিনি লিখেছিলেন— *'আমি জানি চোখে রেটিনা ছিন্ন হবার অসুখে তুমি আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় নিদারুণ অসুবিধা সত্ত্বেও তুমি পনের দিন অন্তর আমাকে দেখতে আসছ। অথচ আমি তোমার পাশে থাকতে পারছি না ... আমি এখন জেলখানায় আটক বন্দী। প্যারোল আমি চাইতে পারি না, প্যারোল দেওয়া হলেও আমি তা নিতে পারবো না। আমরা যারা নেতা, তাদের নিকট আত্মীয়ের অসুস্থতার জন্য প্যারোল চাই কীভাবে.... অন্যান্য সহকর্মীদের সামনে আমাদের অনেক উঁচু দৃষ্টান্ত ও আচরণ তুলে ধরা দরকার। তা না হলে জেলখানায় শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। গত বছর কমরেড এম বি'র (এস বাসবপুন্নাইয়া) স্ত্রী যখন দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কেরালা সরকার তখন তাঁকে প্যারোল দেয়নি। অন্ধ্র সরকারও প্যারোলে ছাড়তে দেরি করিয়ে দিয়েছে। অনেক্ষ কেত্রে কমরেডদের নিকট আত্মীয় মারা যাবার পর প্যারোলের আদেশ এসে পৌঁছেছে। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, প্যারোলের জন্য আবেদন আমরা করবো না।'* এই রকম মানুষ ছিলেন পি সুন্দরাইয়া।

তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও সুদৃঢ় বৈপ্লবিক প্রত্যয়ে সমন্বিত বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও

একাত্মবোধ মার্কসবাদীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টি করে সেই বোধ ছিল তাঁর জীবনে এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কথায়-বার্তায় আচার-আচরণে এই বন্ধনকে তিনি সুদৃঢ় করেছিলেন। আসলে পারিপার্শ্বিক চেতনা যখন প্রবল হয় ব্যক্তি তখন অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রকাশেও সমাজকে পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে তুলে ধরার সামর্থ্য অর্জন করে। সে সামর্থ্য তাঁর ছিল বলেই একজন কমিউনিস্ট হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ও কতর্ব্য সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াটিও ছিল বিশিষ্ট। তিনি কখনো প্রতিকূলতায় ভেঙে পড়েননি, আবার সাফল্যে ভেসে যাননি। লক্ষ্য স্থির রেখে, স্তুতি- অপবাদে মাথা না ঘামিয়ে, শরীর স্বাস্থ্য যতদিন তাঁকে সহায়তা করেছে তিনি কাজ করে গেছেন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে। একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ছাড়া আর কোন স্বার্থ তাঁর ছিল না। তাঁর অবদান ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গৌরবান্বিত করেছে।

# কমরেড পি সুন্দরাইয়ার গৌরবময় অবদান

## বি টি রণদিতে

*[সি পি আই (এম) এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং ভারতীর কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা কমরেড পি সুন্দরাইয়ার জন্মশতবর্ষ শুরু হল ২০১২ সালের ১লা মে থেকে। এই উপলক্ষে ১৯৮৫ সালের ২০ মে অর্থাৎ কমরেড সুন্দরাইয়ার মৃত্যুর একদিন পর কমরেড বি টি রণদিভে বিজয়াড়াতে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ স্মরণ সভায় ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি পি সুন্দরাইয়ার জীবন থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং সে সময়ে গোটা পার্টির কর্মকাণ্ডের ওপর বিশদভাবে আলোকপাত করেন। নীচে তারই সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হল।]*

আজ আমরা এখানে আমাদের প্রয়াত নেতা কমরেড পি সুন্দরাইয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একত্রিত হয়েছি। পার্টির ভেতরে এবং বাইরেও হয়তো বা, এমন কোন মানুষ নেই যিনি বা যারা পি সুন্দরাইয়ার মৃত্যুতে ব্যথিত নন। কমরেড লীলা যিনি ছিলেন পি সুন্দরাইয়ার প্রকৃত অর্থেই অবিচ্ছেদ্য সাথী, তাঁকে আমরা জানাচ্ছি আমাদের সহমর্মিতা। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নেতার প্রয়াণ নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে একটা বিরাট ক্ষতি। কিন্তু এই ক্ষতি আরও ভারি হয়ে যাবে যদি আমাদের পার্টি, নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা সঠিকভাবে ঐ ক্ষতির মূল্যায়ন না করতে পারেন এবং কিভাবে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং আমাদের পার্টির একজন অবিংসবাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন তা বুঝতে অপরাগ হন।

### একজন অবিসংবাদী নেতা

প্রত্যেক কমিউনিস্টই একজন অবিসংবাদী নেতা হতে পারেন না। আবার পার্টির প্রত্যেক কর্মীই পার্টির একজন নেতা হয়ে উঠতে পারেন না।

তা হতে গেলে নিঃস্বার্থভাবে পার্টির কাজ-কর্ম করতে হয়, পার্টি, মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান থাকতে হয়। প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই মনে রাখতে হবে যে, আমি আরও ভাল কমিউনিস্ট হব, আরো ভাল কর্মী হব এবং আরো ভাল নেতা হব। সেজন্যে আমাদেরকে বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, একজন প্রখ্যাত পার্টি নেতা হতে গেলে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেগুলোকে আয়ত্ত করতে জানতে হবে।

আমরা সবাই জানি, দেশের জনগণের স্বার্থে এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য কিভাবে পি সুন্দরাইয়া একজন নবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। এখন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা তাদের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন তার মতই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে। কিন্তু তারা কেউ উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট হতে পারেন নি; আবার এমন অনেক নেতা আছেন যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্যবাদী শিবিরে এসেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকেননি অথবা প্রথিতযশা কমিউনিস্ট নেতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন নি। কিছু কিছু নেতা আছেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় প্রকৃতপক্ষেই সাধারণ মানুষ, কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং হরিজনদের দুর্দশার কথা আন্তরিকভাবে ভাবতেন। তাঁরাও কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেন নি।

সাম্যবাদী শিবিরে আসার পর পি সুন্দরাইয়া মার্কসবাদী এবং লেনিনবাদী মতাদর্শের অনুগত হলেন এবং অচিরেই তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মৌলিক নীতিগুলো আত্মস্থ করলেন যার ব্যতিরেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানে আমাদের হাজার হাজার পার্টি সদস্যরা যেমন বিপ্লব সাধনের জন্য পার্টির অস্তিত্ব, তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেন



তখন কিন্তু এমনটা ছিল না। তাহলে ঐ সময়ে ভারতের পরিস্থিতি কি ছিল? রাশিয়ার সফল বিপ্লবের পর অনেকগুলো কমিউনিস্ট গ্রুপ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা সবাই তাদের নিজস্ব ঢঙ্গে কাজ করত। নিজস্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে কমিউনিজমের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অনেক কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল, তা আপনারা জানেন। তারপরেও একটা সর্বভারতীয় পার্টি গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তৎ সত্ত্বেও শিল্পগোষ্ঠীরা তাদের মতই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯২৯ সালে সেই বিখ্যাত মীরাট মামলা হয় এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এই বলে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করার চেষ্টায় লিপ্ত। সেটা ছিল এমন একটা সময় যখন কিনা নবীন কমিউনিস্টরা, ব্যক্তি কমিউনিস্টরা এবং তাদের বিভিন্ন গ্রুপগুলো একটা বড়সড় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করতে সফল হয়েছিল। তবু তারা সবাই মিলে একটা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি ব্যক্তি কমিউনিস্ট যারা সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে ব্রিটিশের জেলে দিন কাটাচ্ছিলেন তারা পর্যন্ত সর্বভারতীয়ভাবে শ্রমিকশ্রেণির একটা সাধারণ, কেন্দ্রীয় পার্টি গড়ে তোলার বিষয়টিকে স্বত:স্ফূর্তভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। সে সময় পার্টিতে যোগ দেয়ার পর অন্যদের মতই সুন্দরাইয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপ্লব সাধনের যে স্বপ্ন তা নিষ্ফলাই রয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা যাচ্ছে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, গণসংগঠনের শক্তি যতই হোক না কেন, এই গণসংগঠনগুলোকে আরো বৃহৎ আকার দেয়ার মত চেষ্টাই করা হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সংগঠনগুলোকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তার কাজকর্মকে সঠিক পথে পরিচালনা করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণের কোন সংগ্রামেই সফল হবে না।

ঐ সময়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে পার্টির যে গুরুত্ব সেটা বুঝানোর প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল জনসংগঠনের ওপরেও যে পার্টির প্রাধান্য সেটাও অনুধাবন করার। এই বিষয়ে অন্যান্য কমরেডদের

সঙ্গে কমরেড পি সুন্দরাইয়ার অমূল্য অবদান রয়েছে। প্রকৃত অর্থে একটি কমিউনিস্ট পার্টি, যে পার্টি জনগণের কল্যাণ এবং সাম্যবাদের নীতির জন্য উৎসর্গীকৃত এবং যে পার্টিতে থাকবে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা যা অন্য কোন পার্টিতে থাকে না এমন একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলা সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, "আমাদের পার্টির নিয়ম শৃঙ্খলা ভীষণ কঠোর এমনকি সামরিক বাহিনীর চাইতেও কঠোর কারণ তা প্রতিটি কমিউনিস্ট স্বইচ্ছায় মেনে নেয়।"

কমরেড সুন্দরাইয়া এমনই একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্যই তিনি একজন সাচ্চা মার্কসবাদী এবং লেনিনবাদী হিসেবে সংগঠন বা পার্টির যে কোন স্তরেই হোক না কেন, নীতি থেকে কোন প্রকার বিচ্যুতি কোনভাবেই বরদাস্ত করতেন না। এই নীতি এবং শৃঙ্খলার জন্যেই পার্টি তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের মত গৌরবময় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিল। সংগঠিত নেতৃত্ব, সঠিক মতাদর্শ এবং সঠিক স্লোগানের জন্যেই কৃষকদের এই অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। নয়তো এই আন্দোলন ভুল পথে চালিত হতে পারত। তেলেঙ্গানা আন্দোলন আবারও প্রমাণ করল যে যদি আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং কৃষকদের সংগ্রামী চেতনাকে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শের সঙ্গে মানিয়ে না নেয়া যায় এবং কৃষি বিপ্লবের যে মতবাদ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না করা যায় তাহলে সেই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে পরিণত হয়, কোন কাজে আসে না।

মাত্র তিন দশক আগে আমরা আরও একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। মালাবার অঞ্চলের কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তাদের সামনে কোন আদর্শ বা তাদের সমর্থনে কোন পার্টি না থাকায় সরকার এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা এই বিদ্রোহকে শুধু কৃষকদের মধ্যে অন্ত:কলহই নয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত করতে পেরেছিল। কাজেই এখন আমরা বুঝতে পারছি কমরেড পি সুন্দরাইয়া কি জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন এবং আমাদের



পার্টি কিসের জন্য সংগ্রাম করছে। শ্রেণীভিত্তিক একটি সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

যখন আমরা আমাদের সাফল্যের কথা বলি, সেগুলোকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যদি আমরা কমরেড পি সুন্দরাইয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই তাহলে, আমরা কি আমাদের বুকে হাত রেখে নিজেদের জিজ্ঞেস করতে পারি যে কমরেড সুন্দরাইয়া যেজন্যে পাঁচ দশক ধরে সংগ্রাম করে গেছেন আমাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা? এর উত্তরে আমাদের বলতে হবে " না।" পাঁচ দশক আগে যে শৃঙ্খলাপূর্ণ বিপ্লবী পার্টি গঠন করার জন্য আমরা সংগ্রাম শুরু করেছিলাম এবং কমরেড পি সুন্দরাইয়াও যে জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছিলেন সেই পার্টি এখনো আমরা গঠন করতে পারিনি। কিছু দিন আগে আমাদের পার্টিই এই মত পোষণ করে যে পার্টির মধ্যে ক্ষমতার প্রতি মোহের সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ কিনা যুক্তরাষ্ট্রীয় ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। যার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে। অন্যথায় কমরেড পি সুন্দরাইয়ার গৌরবময় কর্মকাণ্ডকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।

পার্টির নীতিকে বলিষ্ঠ করার সংগ্রাম, অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে পার্টির প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম এবং একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম, যে সংগ্রাম কমরেড পি সুন্দরাইয়া আজীবন করে গেছেন; তাঁর এই মহান অবদানের জন্যই তিনি পার্টির প্রথিতযশা নেতার স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

### পার্টির নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করা

শুধু মতাদর্শ এবং সঠিক লাইন অনুকরণ করলেই সফলতা আসে না। যদি কোন ব্যক্তি কেবল ঘরে বসে পার্টির প্রাধান্যের বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যান তাহলে, ঐ ব্যক্তি বা নীতির অর্থ থাকবে না। মোটের ওপর, প্রত্যেকটা বিপ্লবী নীতিই জনগণের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে হবে। নীতিগুলো

সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে এবং তাদের মধ্যে এমন একটা বোধ জাগ্রত করতে হবে যে এই নীতিগুলো তাদেরই জন্য এবং তাদেরই নীতি। জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত এবং মতাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যক্তিগত সাহসিকতা ভিন্ন এই মতাদর্শের কোন মূল্য থাকে না। প্রতিটি বিপ্লবী পদক্ষেপ নিতে গেলে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহসী বা নির্ভীক হতে হবে, মতাদর্শগত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যক্তিগত নিষ্ঠা থাকতে হবে। এগুলো ছাড়া কোন মতাদর্শই ফলপ্রসূ হতে পারে না। পি সুন্দরাইয়ার ছিল সেই সাহস, সেই নিষ্ঠা; তিনি শুধুমাত্র নীতির শ্রেষ্ঠত্বের শিক্ষাই দিতেন না, সাধারণ মানুষ, পার্টি কর্মী এবং ব্যাপক জনগণের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন যাতে একদিন এই নীতিরই জয় হয়।

কেবলমাত্র পার্টির নীতির প্রশ্নেই নয়। প্রতিটি বিষয়ে যেমন : পার্টির কাজকর্ম, পার্টির কৌশল, গণসংগঠন, জনপ্রিয় সংগঠন গড়ে তোলা এবং অন্য সব ইস্যুতেই তিনি জনগণের মধ্যে থেকে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করতেন। এর ফলে সাম্যবাদ এবং জনগণের প্রতিদিনকার সংগ্রাম, সাম্যবাদ এবং জনগণের মধ্যে চেতনার উন্মেষ, তাঁর মাধ্যমে একই সূত্রে গাঁথা হয়েছিল। একজন বিপ্লবী যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্ধ সংস্কারে আবদ্ধ পুরোনো সমাজের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, বর্ণভেদ প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়াতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত একজন সম্পূর্ণ বিপ্লবী হতে পারেন না। তিনি যে কৌশলই অবলম্বন করুন না কেন, তার অন্তরে থাকতে হবে একটি অগ্নিশিখা যার আগুনে পুরোনো সমাজকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ে তুলবেন। বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে এমন কিছু শক্তির সঙ্গে আঁতাত করতে হতে পারে বা কৌশলগত বোঝাপড়ায় যেতে হতে পারে যারা আসলে সমাজের প্রচলিত পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে আছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা নাও করতে পারেন। কিন্তু আন্তরিকভাবে এই সমাজটাকে পরিবর্তন করার জন্যেই আমাদের সংগ্রামকে পরিচালনা করতে হবে।



শুরু থেকেই কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মের মত সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে একটা বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং এর প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছে। পার্টি তার কর্মসূচী এবং নীতি ঘোষণার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে কোন সময়ই কোন আপোষ করেনি যদিও ক্ষেত্রভেদে কখনো কখনো বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

সাম্যবাদী শিবিরে যোগ দেয়ার অনেক আগে থেকেই হয়তোবা সুন্দরাইয়ার মধ্যে এই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। তিনি যখন প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন তখন থেকেই তিনি বর্ণভেদ প্রথা এবং হরিজনদের মূল সমাজ থেকে অচ্যুত প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। তখনকার সময়ে গ্রামের সব উচ্চবর্ণের লোকেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে হরিজনদের সমাজে সমান মর্যাদা দেয়ার দাবি করার জন্য দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন ছিল। সাম্যবাদী শিবিরে যোগ দেয়ার পর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই সমাজব্যবস্থার প্রচলিত অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাঁর এই মনোভাব আরো দৃঢ় হয়। উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি জীর্ণ সমাজব্যবস্থার সব কিছুর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদমুখর হন। এই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থার বিরোধিতার সঙ্গে আমাদের অনেক কমরেড, পার্টি নেতা এবং কর্মী সহমত পোষণ করেন, এরপরেও কিন্তু পার্টির উচুস্তরের বেশিরভাগ কমরেডদের মধ্যেই এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে যে তুমুল ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার কথা ছিল, সেটা হয়নি।

অন্য সব কিছুর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে, পার্টির কাজ করার সময় কমরেড পি সুন্দরাইয়ার এই অবদানের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, কারণ আমাদের পার্টিটাই হচ্ছে সামন্ততন্ত্রবিরোধী পার্টি।

কমরেড পি সুন্দরাইয়ার বাকি জীবনটা কেটেছে মার্কসবাদ লেনিনবাদ এবং মার্কসীয় মতবাদের পার্টিকে প্রতিরক্ষার জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামের

মধ্য দিয়ে যা জীবনের শুরুতেও করেছেন। তবু এই সময়টা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

কমরেড পি সুন্দরাইয়া যখন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন প্রাথমিকভাবে তখন কাজ করাটা অনেক সহজ ছিল। কারণ, তখন পার্টির বাইরে কমিউনিস্ট বিরোধী যে মনোভাব ছিল তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। তখনকার কাজ ছিল একটা সাধারণ মতাদর্শের ভিত্তিতে বর্ধিষ্ণু কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোকে একত্রিত করা। সমূহ কাজ ছিল জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব বা অবস্থান যাচাই করে একটা সাধারণ কর্মসূচীর ওপর ভিত্তি করে সমস্ত কমিউনিস্টদের একটা সাধারণ মঞ্চে সমবেত করা এবং আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব তৈরি করা।

## পার্টির ভেতরে সংগ্রাম

পরবর্তী সময়ে যখন পার্টি বড় হলো এবং দেশে বিভিন্ন প্রকার ঘটনা ঘটতে লাগল তখন পার্টির ভেতরে একটা দোদুল্যমান মনোভাব লক্ষ্য করা গেল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে পার্টির ভেতরকার সংগ্রাম আরো তীব্র হল। পার্টি গঠনের প্রক্রিয়ার কারণেই কোন না কোন সময় বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর ক্ষেত্রে পার্টির মধ্যে এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। আমাদের দেশে ও এটা হয়েছে, ১৯৬২ অথবা ১৯৬৪ সালে অথবা বলতে গেলে এরও কিছু আগে থেকে এবং চলেছে পাঁচ থেকে দশ বছর সময় ধরে। এখানে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটো পক্ষ ছিল এবং লড়াইটা ছিল এই দু'পক্ষের মধ্যেই। পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে মূল বিষয়বস্তু কি ছিল?

স্ট্যালিন যেমন বলেছিলেন, " পার্টির এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পার্টির বাইরে যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের অনুভূতি বা মতামত প্রতিফলিত হয়। এগুলো হচ্ছে পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের প্রতিফলন।" আমাদের দেশে ও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই যে কংগ্রেস সরকার, তাকে নিয়ে আমরা কি করব? এই সরকারটা আসলে আমাদের কত কাছের, কতই বা



দূরের?

কেন এমনটা হলো? যেকোন ঔপনিবেশিক দেশে এমনটা হতে বাধ্য। কারণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আমাদের পার্টিতে মধ্যবিত্ত এবং পাতি- বুর্জোয়াশ্রেণি থেকে কিছু সৎ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লোকও ছিল। তাদের সততা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু তাদের অজ্ঞানতাবশতঃই তারা স্বাধীনতা লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তার সঙ্গে সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদকে গুলিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই জয়কে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত করে কৃষকদের শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি দেয়ার প্রশ্ন সামনে এলো তখনই তারা ইতস্তত ভাব দেখাতে শুরু করল। বর্তমানের যে সংগ্রাম সেটা এখন আর সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম নয়। এখনকার সংগ্রাম হচ্ছে দেশে বুর্জোয়া জমিদারশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

পার্টির এই অংশের লোকগুলোর অবস্থা যেন মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুনেরই মত যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরব সেনাদের দেখে অর্জুন যেমন বলেছিলেন যে ওঁরাতো সব আমার মামা চাচারাই, ওদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরব কেমন করে? পার্টির মধ্যেকার সংশোধনবাদীদের মনও তখন তেমনি করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শত হলেও তারাতো সবাই নেহরু চাচা বা প্যাটেল মামাদেরই সহচর, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় নাকি? এতো স্পষ্টতই পার্টির মধ্যেকার বুর্জোয়া প্রভাবে দৃষ্টান্ত যা, পি সুন্দরাইয়া, এম বাসবপুন্নাইয়া এবং অন্যরা অনুধাবন করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চলছিল এবং ১৯৬৪ সালে সেই লড়াই শেষ হয়। পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। এক্ষেত্রে মার্কসবাদ লেনিনবাদের পক্ষে এবং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে পি সুন্দরাইয়া দৃঢ় এবং আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই ছিল পি সুন্দরাইয়ার প্রধান অবদানগুলোর একটি। এই লড়াই ব্যতীত এই দেশে প্রকৃত অর্থে একটি খাঁটি মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টির অস্তিত্ব থাকত না।

কমরেডরা, আপনারা নিজেরাই নিজেদেরই একটা প্রশ্ন করুনত, কেন মাত্র কিছু কমরেড সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বাকিরা লড়াইয়ের ময়দান থেকে পিট্‌টান দিয়েছিলেন? পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে যে, পার্টি এবং পার্টি নেতৃত্বের একটা অংশই কেবল ভারতের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদের প্রায়োগিক দিকটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এর বাস্তবতা এবং নীতিগুলোকে ধরে রাখতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। অন্যরা তা না করে ব্যবহারিক রাজনীতির নামে মার্কসবাদ লেনিনবাদের মৌলিক নীতিগুলোকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু আপনারা এখানে কমরেড পি সুন্দরাইয়ার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এসেছেন কাজেই একটা প্রশ্ন সামনে উঠে আসছে আর সেই প্রশ্নটা হল, আপনারা কি উনার অবদানগুলোকে রক্ষা করতে পারবেন? অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতার সাহায্যে আপনারা কি পারবেন মার্কসবাদ লেনিনবাদের নীতিতে বিশ্বাসী এই পার্টিকে রক্ষা করতে এবং কমরেড পি সুন্দরাইয়া যে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তা নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে? এর উত্তর অবশ্যই 'না' হবে। কারণ এটা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের নীতি অধ্যয়নের বিষয়টাকে তাদের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং জীবনের প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্তে এর থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন। লেনিন এক সময় বলেছিলেন, 'তিনিই প্রকৃত মার্কসবাদী যিনি মার্কসবাদকে তার আত্মচেতনা বা আত্মজ্ঞানের একটা অংশ করে নিতে পেরেছেন এবং মার্কসবাদ এবং মার্কসীয় প্রতিক্রিয়া একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। আমাদের পার্টি কর্মী এবং পার্টি সদস্যের মধ্যে কেবলমাত্র একটি নগন্য অংশই দাবি করতে পারেন যে তারা মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদের তত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য এবং তা আত্মস্থ করার জন্য এতটাই সময় দিচ্ছেন যার ফলে আমরা আমাদের এই মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিকে রক্ষা করতে পারি। কমরেড পি সুন্দরাইয়ার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হলে আমাদের সবাইকে এই সংকল্প করতে হবে যে, আমরা সবাই গভীরভাবে এবং বার বার করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের



নীতিগুলো অধ্যয়ন করব।

## প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা

আরেকটা বিষয় যা এখন সর্বজনগ্রাহ্য, কিন্তু যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় হয়তোবা এখনো আসেনি, সেটা হচ্ছে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা। আমাদের পার্টি প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাতে বিশ্বাসী পার্টি। বিশ্বের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা বিশ্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। আপনারাও তা স্পষ্টতঃই বোঝেন আন্তর্জাতিক স্তরে আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিভাবে বিভিন্ন দলগুলো কাজ করে। কিন্তু তাদের সবাইকে একটি বিশ্বব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবেই কাজ করে যেতে হবে। সমাজতন্ত্রী ছিলেন অনেকেই, তাদের মধ্যে কিছু ছিলেন কমিউনিস্ট যারা কমরেড পি সুন্দরাইয়ার সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের কাউকেই সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট আন্দোলনে পাওয়া যায় নি। এমন অনেক পার্টি ছিল যাদের মূল হচ্ছে সমাজতন্ত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলো লোকদল, জনতা অথবা কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গেছে। ঐ পার্টিগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এদের মধ্যে কিছু সৎ এবং নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণি ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঠিক যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হননি।

সুন্দরাইয়া কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শৃঙ্খলাকেও গ্রহণ করে নিলেন। তিনি এও বুঝলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বে সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলন এবং অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সবই একই সূত্রে গাঁথা বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্র। চল্লিশ বছর আগে একমাত্র আমাদের পার্টিই সেটা বুঝতে পেরেছিল এবং সেজন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত পার্টির টিপ্পনিও শুনতে হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে শাসক কংগ্রেস দলসহ আমাদের সমস্ত সমালোচকরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ান যে জয় তার চল্লিশতম বর্ষ উদ্‌যাপন করছিল।

এখন সবাই জানেন যে, সেটা ছিল একটা দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা যার ফলে গোটা পৃথিবীটারই মানচিত্র পাল্টে গিয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হয়েছিল পতন এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত।

আমাদের পার্টি কিন্তু আগে থেকেই এই অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছিল এবং কোন পথ ধরে আমাদের এগোতে হবে জনগণকে তার আভাসও দিয়েছিল। প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুন্দরাইয়া পার্টিকে সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কিন্তু আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যখন ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ শুরু হল। যদিও সে সময় পর্যন্ত পার্টি অভিন্নই ছিল। কিন্তু পি সুন্দরাইয়া, বাসবপুন্নাইয়ার মত অন্য আরো যারা সে সময় সঠিক প্রলেতারীয় অবস্থান নিয়েছিলেন, কংগ্রেস সরকার তাদেরকেই জেলে পুরেছিল। কমিউনিস্টদের এই অংশটিকে 'চীনের দালাল' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। এমন একটা সঠিক অবস্থান যে কোন বিষয়ে নিলে সব সময় তাই হয়। আমাদের পার্টি এই যে লড়াই করেছিল এর মধ্যে ফুটে উঠেছে সঠিক আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গী, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম। এ লড়াইটা না করলে আমাদের পার্টি একটা উগ্র স্বাদেশিকতাবাদ এবং চীনের পার্টির বিরোধী পার্টি হিসেবেই পরিচিতি লাভ করত এবং চীনা বিপ্লবের যে মহান বিষয় তা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলত।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার প্রতি আমাদের আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে এ ছিল আমাদের কাছে একটা অগ্নিপরীক্ষারই মত। কারণ এই লড়াই শুধুমাত্র শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই ছিল না। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মত একটা বৃহৎ পার্টির বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়েছিল।

সি পি এস ইউ এখন যে ভূমিকা পালন করছে তার জন্যে অবশ্যই আমরা সাধুবাদ জানাব। তারা তাদের দেশে সমাজতন্ত্রকে সুরক্ষিত করেছে এবং যুদ্ধের প্ররোচনাদানকারী রেগনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু ঐ সময়ে এর মত একটা মহান পার্টিরও সমালোচনা করতে হয়েছে। কারণ

ইন্দো-চীন সীমান্তে তখন যা ঘটেছিল যা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। এখনো একই প্রশ্ন সামনে আসে যখন শাসক দলের মত একটা বিশাল দলের বিরুদ্ধে আমরা সাহস করে লড়াই করি, তাদের ভূমিকায় সমালোচনামুখর হই আর তাতে দেশের জনগণের একটা অংশ আমাদের ভুল বুঝে। এই সাহসের উৎস হচ্ছে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা এমনকি চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও যখন ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে, তখন আমাদের এই পার্টি নেতৃত্বই এর সমালোচনা করতে পিছপা হয়নি। এসব সম্ভব হয়েছে মার্কসবাদ লেনিনদের মৌল নীতিগুলোর প্রতি সহজাত আনুগত্য থাকার ফলে। এমন অসংখ্য গুণাবলীতে পি সুন্দরাইয়া এবং অন্যান্য নেতারা গুণার্জিত ছিলেন।

কমরেড পি সুন্দরাইয়ার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সব পার্টি সভ্যদের মনে তা প্রোথিত করতে হবে।

কমরেড পি সুন্দরাইয়া এবং তার সাথীরা শুধু ডানপন্থী সংশোধনবাদের, নক্সালদের বিরুদ্ধে নয়, অতি বামপন্থী গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এবং অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংশোধনবাদ এবং গোষ্ঠীগত গোঁড়ামি, এই দুই ধরনের প্রবণতারই প্রতিফলন।

এই বিষয়ে বড় পার্টিগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে, যেহেতু আমরা মনে করতাম যে তাদের এই লাইন ভুল লাইন, আমাদের পার্টি এই দুই পক্ষ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ সময় পার্টির নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কমরেড সুন্দরাইয়া বলতে গেলে একাই হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা যখন এই অবস্থান নিয়েছিলাম তখন কমরেড পি সুন্দরাইয়া ছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক। তাই উভয় পক্ষ থেকে এই যে আক্রমণ এবং গালাগাল সেটা উনাকেই সহ্য করতে হয়েছে। পার্টির মূল নীতির সপক্ষে তাঁর এই দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের ফলে পার্টির কোলকাতা কংগ্রেসে তিনি সর্বসম্মতভাবে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

যখনই আমরা কমরেড পি সুন্দরাইয়ার কথা আলোচনা করি তখনই আমাদের মনে পড়ে ঐতিহাসিক তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের কথা। আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক গৌরবময় অধ্যায়। ঐ আন্দোলন থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা অন্ধ্রপ্রদেশ বা দেশের অন্য কোথাও সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি। এমনকি আমাদের পার্টির সব সদস্য সঠিকভাবে এই আন্দোলনের গৌরবের অংশীদার হতে পারেনি। কমরেড পি সুন্দরাইয়া তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ওপর যে একখানা বই লিখে গেছেন তা তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি এবং তেলেঙ্গানার মানুষের যে মহান অবদান তা জানা এবং সেটা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অনেক সহায়ক হবে।

এর মাধ্যমে আপনি সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারেন এবং বুঝতে সক্ষম হন তাদের তেজস্ক্রিয়তা এবং দীপ্তির বিষয়ে যখন কিনা তারা মার্কসবাদ এবং কৃষি বিপ্লবের মতাদর্শে প্রজ্জ্বল হন। কেউই জন্মগতভাবে নেতা হয় না বা বসার ঘর থেকেও নেতা উঠে আসে না। শুধুমাত্র পাঠাগারের মাধ্যমেও নেতা গড়ে তোলা যায় না। বিপ্লবী মতাদর্শ যখন হয় সাধারণ মানুষের অস্ত্র তখন তাদের মধ্য থেকেই নেতা-নেতৃরা উঠে আসেন। তখন এই মানুষগুলোর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় সুস্পষ্ট গুণগত পরিবর্তন, যারা কিনা গতকাল পর্যন্তও ছিল নিপীড়িত এবং নিষ্পেষিত, যারা এর বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পেত না, নীরবে সব সহ্য করে যেত। তখন এদের মধ্যে আপনি বিপ্লবের অগ্নিশিখা, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা দেখে যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষকেই আবিষ্কার করবেন। তেলেঙ্গানার কৃষককুলের কাছে এটাই ছিল তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অবদান। আর তখন পার্টির বিপ্লবী স্লোগান হয়ে যায় জনগণের স্লোগান। অনেকদিন আগে স্ট্যালিন বলেছিলেন যে, আমাদের দেখতে হবে কৌশলগত স্লোগানগুলো যাতে একদিন জনগণের স্লোগানে পরিণত হয়।

তেলেঙ্গানাতে স্লোগানের ক্ষেত্রে পার্টি এমন কৌশল অবলম্বন



করেছিল যার ফলে পার্টির স্লোগান কৃষির সঙ্গে যুক্ত সব মানুষের স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণি এবং পার্টির বিপ্লবী মতাদর্শ যখন কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায় তখনই প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তেলেঙ্গানা আন্দোলন আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। পার্টি শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শকে আরো বলিষ্ঠ করে তুলেছে আর এই পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণির এই মতাদর্শ ছাড়া তেলেঙ্গানা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হত না। কৃষি বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের বিপ্লবী কৌশল প্রয়োগের যে সুফল সে ব্যাপারে তেলেঙ্গানা আন্দোলন এবং কমরেড পি সুন্দরাইয়ার জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। এই শিক্ষাকে যদি আমরা আত্মস্থ করতে পারি তাহলে আন্দোলন আরো দশগুণ শক্তিশালী হবে। আমরা কি করতে পারব? সে ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সময়ে অনুরূপ কৌশল গ্রহণ করতে হবে যার ফলে দুটি বিপ্লবী শক্তি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী আর তার মতাদর্শ এবং কৃষকদের ক্ষোভ এবং মতাদর্শ দুটো এক হতে পারবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্যই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অক্ষশক্তি।

কতগুলো বিশেষ গুণাবলীর জন্যই কমরেড পি সুন্দরাইয়া এই সাফল্যগুলো অর্জন করতে পেরেছিলেন। আমি এর আগে তাঁর নিষ্ঠা এবং জনসংযোগের কথা উল্লেখ করেছি। হয়তো বা সি পি আই (এম) এর আর কোন নেতা নেই যিনি তাঁর মত জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছিলেন এবং যিনি ছিলেন জনগণের জন্য, জনগণ থেকে এবং জনগণের সঙ্গে। কমরেড পি সুন্দরাইয়া এবং এ কে গোপালন, এই দুজন নেতা সবসময়ই জনগণের মধ্যে থাকতেন। সেজন্যেই পার্টির আদর্শ রূপায়ণ করা এবং তা আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো বেশি মানুষের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। আর সেজন্যই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে এক অবিসংবাদী নেতা

হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

কমরেড পি সুন্দরাইয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল কোন কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার প্রবল ইচ্ছা। তিনি কোন বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে না জেনে কিছু বলতেন না। তিনি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি সেটা খুঁটিয়ে দেখতেন, এভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরই কেবল প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। তাঁর পার্টি কাজকর্ম সব সময়ই ছিল পরিকল্পনা-মাফিক। তাঁর মতে যে কোন কাজের জন্য একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করতে হবে। কোন তুচ্ছ কাজের ক্ষেত্রেও তিনি পার্টি সদস্যদের কথা এবং সে ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবের কথা মাথায় রাখতেন। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি কাজ করার সময় পার্টি তাতে নেতৃত্ব দেয়ার অবস্থায় আছে কিনা এবং সেটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে কিনা তা যাচাই করে নেয়া।

কমরেড পি সুন্দরাইয়ার আরেকটি বড় গুণ হচ্ছে পার্টি কর্মী এবং সদস্যদের সঙ্গে অতি সহজে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা। এর সুফলও তিনি পেয়েছেন। আর সেজন্যই তিনি পার্টি কর্মী, সদস্য এবং পার্টির বাইরের লোকেদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিলেন যা তাঁকে পার্টির একজন অবিসংবাদী নেতায় পরিণত করেছিল। এমন নয় যে কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়েছিলেন বলেই তিনি এমন নেতা হতে পেরেছিলেন। পার্টি লাইনের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং নিষ্ঠা, সহজ সরল জীবন-যাপন, কর্মীদের মধ্যে সহজলভ্য হওয়া। এই সমস্ত গুণাবলীই কমরেড পি সুন্দরাইয়াকে একজন সম্পূর্ণ এবং ব্যতিক্রমী নেতা হতে সাহায্য করেছিল।

তাঁর মত দায়িত্বশীল হয়ে যদি আমরা সর্বদা পার্টি কর্তৃক আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার চেষ্টা করি তাহলেই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। পার্টির বাইরে তাঁর যে কি বিশাল প্রভাব ছিল তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি গতকাল তাঁর অন্তিম যাত্রায় লাখো লাখো লোকের সামিল হওয়া থেকে। জনতা কমরেড পি সুন্দরাইয়াকে ভালবাসতো



এবং অন্যান্য পার্টির নেতৃবৃন্দ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু আমাদের পার্টি এবং পার্টি নেতৃবৃন্দের সৌভাগ্য যে তাঁর অবদানকে আরো ছড়িয়ে দেয়া আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তিনি আমাদের ওপর দিয়ে গেছেন। চলুন, আমরা নিজেদেরকে এই দায়িত্ব পালন করার যোগ্য করে গড়ে তুলি।

**(২৩শে এপ্রিল, ২০১২ এর পি ডি থেকে নেয়া)**